বঙ্কিম চন্দ্রের

# দীনবন্ধু-জীবনী।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, প্রকাশিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর সি, আই, ই,

প্রণীত

# দীনবন্ধু-জীবনী।
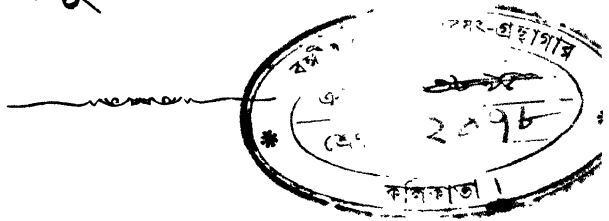
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩০।৩ মদন মিত্রের লেন,

দীনধাম, কলিকাতা।

১৩১৬

[ মূল্য ।০ চারি আনা।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# নিবেদন।

১২৮৩ সনে, পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের জন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবন-চরিত লিখিয়া দেন। পরে, এই রচনার স্বত্ব আমাদিগকে দান করিয়া, উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন। তদবধি জীবন-চরিত আমাদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

১২৯৩ সনে, পিতৃদেবের বাল্য-রচনা-সংযুক্ত গ্রন্থাবলীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের জন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক একটি সমালোচনা লিখিয়া দেন। জীবনীর ইদানীন্তন সংস্করণে ইহাও সন্নিবিষ্ট আছে।

এই দুই মহাপুরুষের বন্ধুত্ব, সাহিত্যের অঙ্গীভূত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণয়ের পরিচয় কেবল মাত্র সাহিত্যে পাওয়া যায়, এমন নহে। কার্য্যতঃ, তিনি তাঁহার রচনার উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিয়া, স্বীয় পরলোকগত বন্ধুর সন্তানগণের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও দয়ার মধুর নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তাঁহার ঋণ আমাদিগের পরিশোধ করা অসাধ্য। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইঁহাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে, আর একটি কথা বলিবার আছে। পিতৃদেব স্বীয় নবীন তপস্বিনী বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মৃণালিনী উৎসর্গ করেন। কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যুর সময় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে কিছুই লেখেন নাই। ইহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ"এ ইহার এইরূপ কৈফিয়ত দিয়াছিলেন—"আমার আর একজন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী, তাহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই, দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের

কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু; আমার সঙ্গে,সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখন কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না—" কিন্তু তিনি এইখানে নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পরে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বন্ধুত্ব ইহলোক পরলোক ব্যাপী; স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। ইহা হইতেই আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি এবং যদি বীজের সহিত বৃক্ষের তুলনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, আনন্দমঠের উৎসর্গ বাঙ্গালা সাহিত্যের "In Memoriam."

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়, "অঞ্জলি দান" নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া যে কয়েকটি ছত্র লিখিত হয়, তাহা "বঙ্কিম-দীনবন্ধু" নামে অভিহিত হইয়া পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। পিতৃদেবের ১৩১৩ সালের মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে, অগ্রজ মহাশয় "দেবস্বপ্ন" নামক আর একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা অবলম্বন করিয়া,পিতৃদেবের কাব্যের যে অনুশীলন করিয়াছেন, তাহা বিজয় বাবুর অনুমতি অনুসারে পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বিজয় বাবু এই অনুমতি দানে আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা ১৩১৬।
দীনধাম, কলিকাতা।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।
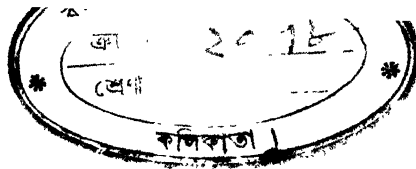
# দীনবন্ধু-জীবনী।

## ১। জীবনী।

দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই;—দীনবন্ধুর যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যক নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাতশূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরি-শোধ করিবার যত্ন করিব না।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে

চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে; যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এইজন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটী গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বরগুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু-পেট্রীয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বরগুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এখনকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বরগুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

"এলোচুলে বেনে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়
নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়,

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারিজন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বরগুপ্ত এবং

দীনবন্ধু। সজেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য, এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যতদুর সাদৃশ্য, ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর ততদূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেকদূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ ( Wit ) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন.—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র" নামক একটী কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জন খানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা কখন পুনর্মুদিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পংক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া॥

একটী কবিতা এই—

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥

আর একটী—

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ॥

—ইত্যাদি।

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে, “জামাই-ষষ্ঠী” নামে দুইটি কবিতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই-ষষ্ঠী” যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। “জামাই-ষষ্ঠী”তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদ-পত্রে “কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের” উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল।

দীনবন্ধু প্রভাকরে “বিজয় কামিনী” নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে “নবীন তপস্বিনী” লিখিত হয়। “নবীন তপস্বিনী”র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যানকাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠ্যাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ বেতনে

পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতন বৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড়শত টাকার পোষ্টমাষ্টার থাকিতেন সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্‌স্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের কার্য্যের নিয়ম এই ছিল যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্ট আপিসের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেড-কোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সম্বৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃই তিনি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা-প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্র সৃজনে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীল-বিষয়ক গোলযোগ উপ-স্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ, পোষ্ট আপি-সের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়।

তাহারা শক্রতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে ; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হয়, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত. দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটী অপূর্ব্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইয়ুরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সীটনকার

অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাড়ী, মাজী সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তবিক নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আদ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময়ে মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবন রক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্বচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতে-ছিলেন, এমন সময় দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং স্বত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া

বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপরনিউমররি ইনস্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আফিসের কার্য্য কয় বৎসর অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তিনি "রায়বাহাদুর," উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেননা দীনবন্ধু বাঙ্গালিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ এই দুইজন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরুভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছার, প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বস্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না, charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকটরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচারবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

নবীন তপস্বিনীর পর "বিয়েপাগলা বুড়ো" প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগুলিন গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীল-দর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত; "নবীন তপস্বিনীর" বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "সধবার একাদশীর" প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। "জামাই-বারিকের" দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "বিয়েপাগলা বুড়ো" ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষিত করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ, এবং "প্রচলিত খোসগল্প"হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। "নবীন তপস্বিনীতে" ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; "জলধর" "জগদম্বা" Merry Wives of Windsor হইতে নীত।

বাঙ্গালি-পাঠক মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেননা জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থ-মূলক। মহাভারত, রামায়ণের অনুকরণ। ইনিয়দ্, ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?

"সধবার একাদশী" "বিয়েপাগলা বুড়ো"র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপুর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। "সধবার একাদশীর" যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, যে ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা "নিমচাঁদকে" দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।

"লীলাবতী"বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিন খানি কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়. Lady of the Lake নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ করিলেন, গদ্যকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা ষোলখানি নবেল। Kenilworth নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণাতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের যে সম্বন্ধ, Ivanhoe এবং Kenilworth প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদ্যকাব্যের সেই সম্বন্ধ।

"লীলাবতীর" পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর "সুরধুনী" কাব্য "জামাইবারিক" এবং "দ্বাদশ কবিতা"

অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়। "সুরধুনী" কাব্য অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ "বিয়েপাগলা বুড়ো"রও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয় অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ ছিল।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলেকামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে। সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজ কাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যলোকে —চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন। কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবন-স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল, বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে,

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী, এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্ব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, এক দিন তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচিবে না"। দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "কে বলিল?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাঁহার রস উদ্দীপন-শক্তি শুকাইয়াছে কি না আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটী পৃষ্ঠ দেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটী বামপদে হইল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটী কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।"

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে ;—দীনবন্ধুর ছিল না। মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে ;—দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া, শেষে নিস্ফল হইয়া বলিয়াছেন "কই, রাগ যে হয় না।"

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়,তাহা জমাই-বারিকের "ভোতা রাম ভাটের" উপরে। যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ সেই খানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না ; যিনি বহু গুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয় ; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে ; সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্ব্বিরোধ, নিরহঙ্কার এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেননা প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন "নবীন তপস্বিনী" প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই ; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরীর উমেদারী করিয়া নিস্ফল হইয়া সেই

রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন,—নিম্ন শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাঁহার সমুচিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "কলিকাতা রিবিউ"র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দেখিলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে "সুরধুনী" কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। "ভোতারাম ভাট" দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক!

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে,দীনবন্ধু কখন একটীও অসৎ কার্য্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্য্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমত কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন,তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটী দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহ-সুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইহাঁদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।

দীনবন্ধু আটটী সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি সংসারের একটী প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

---

## ২। কবিত্ব।

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রহস্যসন্দর্ভে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পরবৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধি স্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দানবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেট খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে

বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাড়ায়।

কি উপায় লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারি খানা পল্লীগ্রাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদেব কাছেও দেশ

সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়,তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি ? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি ?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গাঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষিয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদের-চাঁদ, হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে"হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি,তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism. তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে

সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি নাই। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃত-শিক্ষা নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণ বশতঃ শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে

কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন, যে দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ; কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না। এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল। তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মল চরিত্র; তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা—দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেননা, তিনি সহানুভূতির অধীন। সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই

তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল, যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত,—"তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ মত হইবে ;—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁকে বলিত, "আমার হুকুম—সব টুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সব টুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—যে "না তা হবে না—"তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন,বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ, তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই। তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হোক আর মন্দ হোক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভাল বাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী তীব্রা সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটী গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্ব-ব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের

কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই, যে যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা—( hero এবং heroine ) তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরা· পের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল ; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন ? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন ? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরেজ-কন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালাকাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্ট-শিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্তআদর্শ বাঙ্গালাসমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয় তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজিসাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীন মাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্ষপিয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস, কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গলার Uncle Tom's Cabin. "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের

অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া,নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষায় এমন অনেক গুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সে গুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ গুণের যে উৎপত্তি স্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম,ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি এমন নহে। বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি, ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিত পারিত কি না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।

---

# পরিশিষ্ট।

## দীনবন্ধুর কাব্যের অনুশীলন।

একে ত কবি দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর সহিত বঙ্গদেশের সেকালের ও একালের সকল পাঠকই সুপরিচিত, তাহার উপর আবার কবির কৃতী পুত্রগণ যে সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দরিদ্র বাঙ্গালী পাঠকের গৃহে গৃহে ঐ গ্রন্থাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পাঠকেরা অতি সহজেই আমার বক্তব্যগুলির দোষ গুণ বিচার করিতে পারিবেন। যখন ঐ সুলভ সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ( ১২৮৩ সালে ) কবির বন্ধু ও একালের বঙ্গসাহিত্যের নবজীবনদাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ও কাব্য-সমালোচনায় কবি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ কথা লিখিয়াছেন। বন্ধুর কাব্য-সমালোচনায় পাছে পক্ষপাত ঘটে, এই ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর কোনও কোনও ত্রুটীর কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। পক্ষপাত অতিক্রম করিবার প্রয়াসে যে কখনও কখনও সুধীদিগের বিচার অতিমাত্রায় কঠোর হইয়া দাঁড়ায়, এ সংসারে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমার মনে হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর কয়েকটি মন্তব্য তেমন সুবিচারিত নহে। বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা অবলম্বন করিয়াই কবি দীনবন্ধুর কাব্যের অনুশীলন করিব।

১। নীলদর্পণ।—বঙ্কিমবাবুর সমালোচনায় অবগত হই যে, ১৮৫৯ সালে "পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অস্তমিত", এবং "নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের অভ্যুদয়।" এ কথাও লিখিত আছে যে, যে বৎসর মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশিত হইতেছিল, "তার পর বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়।" আমার মনে হয় যে, কবির এই প্রথম কাব্য, বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের এই প্রথম প্রচারিত দৃশ্যকাব্য অতি অসাধারণ গ্রন্থ। ইহাও মনে করি যে, আজ পর্য্যন্ত "অঙ্ক" শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে এমন একখানি কাব্যও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। নীলদর্পণের মহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একবার বঙ্কিমবাবুর মন্তব্যটুকু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করি।

বঙ্কিমবাবু নীলদর্পণ-প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর পরদুঃখকাতরতা, স্বদেশবৎসলতা ও নির্ভীকতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দীনবন্ধু দীনের বন্ধু ছিলেন, এবং প্রপীড়িতা মাতৃভূমির সেবায় তিনি তখন অগ্রগণ্য ছিলেন;—কবির নীলদর্পণ ইহার সাক্ষী; বঙ্কিম বাবুর মত মহৎ ব্যক্তি ইহার সাক্ষী; বঙ্গের নীলকরদিগের কলঙ্কিত ইতিহাস ইহার সাক্ষী। এ ত গেল কবির চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা; ইহাতে কাব্যমাহাত্ম্য কিছু বলা হইল না। দীনবন্ধু "নীলদর্পণ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন", ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যে এই গ্রন্থের গৌরব কতখানি, তাহা বলা হয় নাই। একেবারে যদি কিছু বলা না হইত, ক্ষতি ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন এই গ্রন্থের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলিবার পর লিখিলেন যে, এ দেশে সামাজিক অনিষ্টের সংশোধনের উদ্দেশ্যে লিখিত কোনও কাব্যই ভাল হয় নাই, এবং হইতে পারে না, তখন একটু স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। ঐ কথাগুলি লিখিয়া তাহার পরে যখন নীলদর্পণের প্রশংসায় লিখিলেন যে, "গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে", তখন বিষয়ের গুণে কাব্যের মনোহারিত্ব বুঝিলাম। ইংরেজি একটি বচনের অনুবর্ত্তিতায় বলিতে পারি যে, ইহাকে বলে,—"ক্ষীণ প্রশংসায় দমিয়ে দেওয়া।"

আদৌ বঙ্কিমবাবুর এই মন্তব্যটুকুই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না যে, যে সকল কাব্য উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয়, "সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট; কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।" যে ইউরোপীয় মন্তব্যের অনুবর্ত্তনে উহা লিখিত, তাহার মূল গেটের একটি বচনে। উহার অতদূর অর্থ করা সঙ্গত মনে করি না। যাহা সুন্দর নয়, তাহা যে কেবল ভাল সাহিত্য নয়, তাহাই নয়; সাহিত্যে অসুন্দর বা কুৎসিতের স্থানই নাই। কিন্তু যাহা "হিত" বা মঙ্গলের জন্য মূলতঃ বিকশিত, সে "সাহিত্য" যে "সংস্করণে"র উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলে সুন্দর হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। যাহা অসুন্দর কুৎসিত, নীচ ও অকল্যাণকর, তাহা দুর করিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্যে অতি মহান, কল্যাণপ্রদ ও সুন্দর আদর্শ স্থাপিত হয়; আমরা সাহিত্যের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া নীচতার প্রতি আসক্তি অতিক্রম করি।

একটা উদ্দেশ্যহীন খেয়াল লইয়া প্রকৃতির যে কোনও ছবি দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া লইলেই, কাব্য গড়া যায় না; সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায় না।

যাঁহারা ছবি তুলিতে জানেন, ছবি কি তাহা বুঝেন, তাঁহারা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোনও দৃশ্য তুলিবার জন্যই "ক্যামেরা" পাতেন না। আমরা কোনও জিনিস সুন্দর দেখি কেন, সে তত্ত্বের একটা আলোচনা না করিলেও, এই সহজ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারি, যেগুলি মনুষ্যত্বের কল্যাণময় বিকাশের ফল, তাহা আমাদের চক্ষে পরম সুন্দর—অকৃত্রিম স্নেহ সুন্দর, অচল ভক্তি সুন্দর, আত্মবিস্মৃত প্রণয় সুন্দর, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা সুন্দর। কৃত্রিমতা, চপলতা, নীচতা ও স্বার্থপরতায় যেখানে ডুবিয়া থাকি, সেখানে কবি-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সংস্করণ ও উদ্ধারের কার্য্য সাধন করে। কবির সেই আদর্শ-সৃষ্টি একটা খেয়ালের ফলে নয়; যাহা সুন্দর, তাহাই সম্ভোগ্য ও হিতকর বলিয়া সে আদর্শ উপস্থাপিত হয়।

কাহারও মনে যদি কোনও সমাজ-সংস্কারের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবে তিনি যাহা অকল্যাণকর ও অসুন্দর, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা জীবনপ্রদ ও সুন্দর, তাহাই স্থাপন করিতে চাহেন। সেই উদ্দেশ্যটাই যখন সুন্দর, তখন কাব্য-কৌশলের অভাব না থাকিলে সে উদ্দিষ্ঠ সৌন্দর্য্য কেন যে সুন্দর করিয়াই প্রদর্শন করা যাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। দুঃখপ্রপীড়িত পথভ্রান্ত মানবের পরমকল্যাণকামনায় ভগবান বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদান গ্রন্থে পাই; উদানে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, জগতের কোন্ সাহিত্যে তাহা আছে? নিঃস্বার্থ মঙ্গলকামনার মত সুন্দর যখন কিছুই নাই, এবং সংস্করণের উদ্দেশ্য যখন তাহাই, তখন সে উদ্দেশ্যতে কাব্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। যদি শিল্প-চাতুর্য্য না থাকে, তবে খেয়ালেই হউক, উদ্দেশ্য লইয়াই হউক, কিছুতেই কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধান সম্ভব হয় না।

নীলকরেরা যে ভীষণ অত্যাচারে বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে পিষিয়া মারিতেছিল, দীনবন্ধু যে তাহার প্রকৃতি ছবি আঁকিয়াছেন, এ কথা বঙ্কিম বাবু স্বীকার করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পল্লীচিত্র ও চাষার জীবনের সহিত দীনবন্ধুর মত অল্প লোকই সুপরিচিত ছিলেন, এবং দীনবন্ধু "ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সীর ও তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজার নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন।" তাহা হইলে, নীলদর্পণে উপস্থাপিত চিত্রগুলি যে প্রকৃতির মুখের উপর দর্পণ ধরিয়া অঙ্কিত, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। তবে ঐ ছবিগুলি কাব্যের উপযোগী হইয়া চিত্রিত হইয়াছে কি না, তাহা দ্রষ্টব্য।

নাটকের রঙ্গমঞ্চখানি পল্লীর চিত্রপট দিয়া সাজানো। ঘরে বসিয়া পড়িবার সময়েই হউক, আর অভিনয় দেখিবার সময়েই হউক, যদি মনে হয় যে, আমরা যথার্থ পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে রঙ্গমঞ্চখানি সুরচিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। আমি পল্লীগ্রামবাসী; এবং আমাদের সেই ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম বহুদিন নীলকরের দখলে ছিল। আমি যখনই নীলদর্পণ পড়ি, বা উহার অভিনয় দেখি, তখনই সহর নগর ভুলিয়া, পল্লীবাসী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছি বলিয়া অনুভব করি। ক্ষেত্রমণি ও রেবতী যখন জল নিয়ে আসে, রাইচরণ যখন লাঙ্গল হাতে করিয়া যায়, সৈরিন্ধ্রী যখন চুলের দড়ী বিনায়, সরলা যখন আদুরীর সঙ্গে রহস্যালাপ করে, তখন কাহার সাধ্য যে, ভুলিয়াও একবার সহরের কথা ভাবিতে পারে? প্রাকৃতিক ছবির এই সমাবেশই কি যথার্থ শিল্পচাতুর্য্য নয়?

রঙ্গমঞ্চের পরে অভিনেতৃগণের প্রতি দৃষ্টি করিব। বঙ্কিমবাবু অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে, "যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত —সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে।" বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর রায়, হাইকোর্টের শেষ নিষ্পত্তির মত। এই এক কথায় নীলদর্পণের গৌরব একবারে মাটী হইয়া যায়। অঙ্ক শ্রেণীর দৃশ্য-কাব্যে করুণরস স্থায়ী হইলেই কাব্য সার্থক হয়। সমগ্র নাটকখানি পড়িয়া উঠিবার পর যে সে ভাব ঐ কাব্যে ও পাঠকের মনে সম্পূর্ণ স্থায়ী হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। বন্ধুবর্গের সঙ্গে বসিয়া গ্রন্থখানি পড়ি-য়াছি; অভিনয়ে বহু দর্শকের মনের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহাতে উহার করুণরসাত্মক ভাবের অভিব্যক্তিই অনুভব করিয়াছি। আমরা কেহ বঙ্কিম-বাবুর মত রসজ্ঞতার দাবী করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ পাঠকেরাও যদি নীলদর্পণ পড়িয়া দলে দলে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তবে নীলদর্পণে করুণ রসের অভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। সমষ্টিভাবে সমগ্র গ্রন্থে যে রস স্থায়ী, তাহা যে নাটকের প্রযুক্ত পাত্রে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব? অত্যাচারীর নিষ্পেষণে নিরীহ গ্রামবাসীরা যে ভাবে মনে প্রাণে মারা যাইতেছে, বঙ্কিম বাবু তাহা ত অপ্রাকৃতিক চিত্র বলেন নাই; তবে কি কারণে বলিব যে, ঐ চিত্রগুলি করুণরসরঞ্জিত তুলিকায় অঙ্কিত নহে?

সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রীর নীরব আত্মত্যাগে ও পতিপুত্রসেবায় যে ছবি পাই, তাহা কোমল, মধুর ও অকৃত্রিম বলিয়াই বুঝি। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর দুর্দ্দশা ও সুকোমলা গৃহবধূ সরলার দুঃখে যদি অতি কোমল অকৃত্রিম করুণভাব না থাকে, তবে বঙ্গসাহিত্যে উহা কোথায় আছে, জানিতে চাই। হাঁ ও না লইয়া তর্ক চলে না, নাটকের সমগ্র দৃশ্যও তুলিয়া দেখাইবার উপায় নাই। পাঠকেরা নিজে নিজে পড়িয়া বলুন যে, বঙ্কিম বাবুর কঠোর সমালোচনা উপযুক্ত হইয়াছে কি না? চাষার মেয়ে ক্ষেত্রমণির সতীত্ব-মাহাত্ম্য যে "স্থূল" কথায় প্রকাশিত, তাহার মধ্যে কি অতি "সূক্ষ্ম" সৌন্দর্য্য নাই? গরীবের মেয়ের অতি কোমল, মধুর, অকৃত্রিম ও প্রশান্ত পতিভক্তি যেখানে পদদলিত হইতেছে, সেখানকার করুণ রসে সিঞ্চিত হইলে, অত্যাচার-সংহারের জন্য মনে যে তেজ সংক্রামিত হয়, তাহাকে কোন্ রসের অভিব্যক্তি বলিব?

(২) লীলাবতী।—বঙ্কিম বাবু এই সুরচিত নাটকখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"লীলাবতী বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে।" এই প্রশংসার পর আবার অপর স্থানে আছে যে, "লীলাবতী"র চিত্র জীবন্ত নয়, বরং ঐ চরিত্র "বিকৃত"। "লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকার সম্বন্ধে তাঁহার (দীনবন্ধু) কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে,-এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি।.....দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যের নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। দীনবন্ধু প্রাচীন সংস্কৃত ছাঁচে কিংবা হালের ইংরাজী ছাঁচে লীলাবতী ঢালিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখিব।

যাহা "আজকাল না কি দু একটা হইতেছে" বলিয়া বঙ্কিম বাবু কেবল দূর হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা যে ঠিক বঙ্কিম বাবুর নিকট ঐ অস্বাভাবিক জনশ্রুতি পঁহুছিবার দিন কি তৎপূর্ব্ব দিন ঘটিয়াছিল, তাহা নয়। এ দেশের অনেক লোক যে স্ত্রীশিক্ষা ও একটু বেশী বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য

অনেক পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ ও সংকল্প করিয়া আসিতেছিলেন, দীনবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী "পুরাণ দলের শেষ কবি" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাহা জানিতেন। গুপ্ত কবি তাঁহার অবজ্ঞার জিনিসটা একটা দূরে শোনা কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই; তিনি তাহার বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রত ধর্ম্ম কর্‌ত সবে;
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন্ পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
তখন্ এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল্ কবেই কবে।"

দীনবন্ধু বহুদর্শী ছিলেন; সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই তিনি মিশিতেন; এ কথা বঙ্কিম বাবু বার বার লিখিয়াছেন। যে সকল পরিবারে "ধেড়ে মেয়ে" পোষা ও স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছিল, সে সকল পরিবারের অনেকগুলির সহিতই দীনবন্ধুর মিত্রতা ছিল। ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তবে সুরধুনী কাব্যখানির সাক্ষ্যেই সে কথা বলিতে পারি। যাহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অতি অল্পসংখ্যক পরিবারে বদ্ধ ছিল বলিয়াই যে নাটকের প্রতিপাদ্য নহে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই যে নূতন শিক্ষার স্রোতে নূতন ভাব ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার শুভ অশুভ ফলের কথা সকলেই ভাবিতেন। সেই নূতনত্বটুকু প্রাচীন সমাজের মধ্যে খাপ্ খাইতেছিল কি না, শিক্ষার ফলে প্রাচীনতার দিকে নূতনেরা কি প্রকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এ কথা নাটকের বিশেষ আখ্যানবস্তু মনে করি।ঐ প্রথা যদি অবজ্ঞার জিনিসও হয়, তবুও উহার একটা প্রভাব সমাজের উপর যে ভাবে পড়িতেছিল, তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে।

লীলাবতীকে হিন্দুর ঘরে ঠিক হিন্দুর মেয়ের মতই দেখিতে পাই। তবে সে লেখা পড়া শিখিয়াছে, এবং শৈশব অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হয় নাই। ঠিক এই অবস্থায় হিন্দুর ঘরে ও কৌলীন্য প্রথার মাঝখানে, প্রাকৃতিক ভাবে যাহা ঘটিতে পারে, দীনবন্ধুর গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত দেখি। দীনবন্ধু ঐ প্রথাকে অবজ্ঞার জিনিস মনে করেন নাই বলিয়া, "ধেড়ে মেয়ে" গোছের কথাগুলি, গুলির আড্ডার লোকের মুখেই দিয়াছেন। বিরোধ-বাদেও দীনবন্ধু শিষ্টাচারের পরিহাস করিতেন না; ভদ্রলোকের মেয়ের কথা সসম্মানেই উল্লেখ করিতেন।

ললিতমোহন ও লীলাবতীতে বিলাতী ধরণের কোর্টসিপ্ চলিত এ কথা

বঙ্কিম বাবু কোথায় পাইলেন? তিনি দীনবন্ধুর গ্রন্থ যথেষ্ট পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সমালোচনা লিখিবার সময়ে হয় ত স্মৃতির উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। হিন্দুর গৃহের কুমারী কন্যার সহিত স্বাভাবিক ভাবে যাহাদের সঙ্গে দেখা শুনা হয়, তাহাদের সঙ্গেই হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কুমারী, পরিবারের কোন বন্ধু যুবকের প্রতি যদি আকৃষ্টা হয়, তবে তাহাতেও কিছু অস্বাভাবিকতা নাই। বিবাহের উদ্যোগে যে কোর্টসিপ্ হয় নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝান আছে; ললিতমোহন ও লীলাবতী বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতেন না যে, তাঁহাদেয় এক জনের অনুরাগের কথা অপরে জানিতেন। আর যে দোষ থাকে থাকুক, বর্ণনার অস্বাভাবিকতা দীনবন্ধুর রচনায় কুত্রাপি নাই।

দীনবন্ধুর সময়ের অনুষ্ঠিত প্রথার প্রতি যে কবির অনুরাগ ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। সেই জন্যই শিক্ষিতা বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী তাঁহার গ্রন্থের নায়িকা, এবং সেই জন্যই সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপ্রাণা শারদাসুন্দরী তাঁহার নাটকে আদর্শ মহিলা। মহিমময়ী শারদাসুন্দরী তাঁহার কুশিক্ষিত ও শিথিলচরিত্র স্বামীর চরণে প্রেমভক্তি ঢালিয়া তাঁহাকে সুপথগামী করিয়াছিলেন। এ আদর্শ ইংরাজি ছাঁচে ঢালা নয়। শারদাসুন্দরী স্বামীর "মুক্তিমণ্ডপের" সংবাদ জানিতেন; ভ্রমরের মত ক্ষীরী দাসীর মুখে শোনেন নাই; কুসংসর্গের কথা সুস্পষ্টই জানিতেন; রোহিণীর মিথ্যা ছলে জানিয়া লইতে হয় নাই। তবুও তিনি অনুরাগিণী হইয়া স্বামীকে টানিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইংরেজি ছাঁচ, ইংরেজি প্রেম, ইংরেজি কোর্টসিপ্, বরং নব-বঙ্গ-সাহিত্যের কর্ণধারের রচনায় বেশি লক্ষ্য করিতে পারি। যখন অতুলপ্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্গে নূতনবিধ সরস কথাগ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ ফুটাইবার জন্য রাজপুতের পরিবার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জোর করিয়া অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান নবাবের ঘরের মেয়েকে বন্দীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া, খাঁটী ইউরোপীয় ধরণের প্রেমের প্রগল্‌ভতায় ওসমানকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু যদি নূতনের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া দূরে না থাকিতেন, তবে আমাদের সামাজিক অবস্থা হইতেই অনেক উপাদান পাইতেন; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজপুতের অন্দরমহলের সংবাদ লইতে হইত না।

এ কালের গৃহিণীরা কর্ত্তার রাত্রিকালের ভাতে, পাখার বাতাসে মাছি

তাড়াইয়া দেয় না বলিয়া, দেবী চৌধুরাণীতে তিনি একালের মাথার উপর যতদিন বাজ পড়িবার আদেশ দেন নাই, ততদিন তিনি ইউরোপের আদর্শকেই ঘষিয়া মাজিয়া স্বদেশী করিতেছিলেন। যে যুগে তাঁহার 'সাম্য' রচিত, সেই যুগেই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর সকল কথাগ্রন্থই সুমিষ্ট, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া আমার ধারণা। বিষবৃক্ষে একটি আদর্শ রমণীচরিত্র গড়িতে কাব্যশিল্পীকে কত চেষ্টাই না করিতে হইয়াছে। বড়মানুষ জমীদারের ঘরে একটা অতিরিক্ত উপসর্গ জুটিলে গৃহিণীটি বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যান না; হিন্দু নারীর সামাজিক শিক্ষায় এ শ্রেণীর অসূয়া ও অভিমান জন্মে না। তাহা না জন্মাইলেও ঠিক এ কালের রুচির মত পারিবারিক ট্রাজিডি ঘটাইতে পারা যায় না। এই জন্য শিল্পদক্ষ বঙ্কিম প্রথমতঃ নগেন্দ্রনাথকে সুশিক্ষিত জমীদার করিয়াছেন; এবং সে পরিবারে কিংবা নিকটবর্ত্তী সমাজে তাঁহার অভিভাবকের শ্রেণীর কোনও লোক পর্য্যন্ত রাখেন নাই। বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক থাকিত, তাহারা কেহ সূর্য্যমুখীর কাছে যাইতে সাহস করিত না। অর্থাৎ, নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী সম্পূর্ণরূপে দশ জনের সংস্রব ও মতের প্রভাব হইতে দূরে থাকিতেন। সেই স্থানে পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে গাড়ী হাঁকাইতে দিতেন, সর্ব্বস্বের উপর আধিপত্য করিতে দিতেন। তাই সূর্য্যমুখী সহিতেই পারিলেন না যে, যে গৃহে তিনিও তাঁহার স্বামী তুল্যরূপে প্রভু, যে শয্যা "তাঁহার," সে গৃহ ও সে শয্যা অন্যা কি করিয়া কলুষিত করিবে। বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলপূর্ব্বক সূর্য্যমুখীকে এ কালের মত করিয়া নূতন আদর্শে গড়িয়া লইয়াছিলেন। স্বামী যখন অন্যার প্রতি অনুরাগী, তখন সে যেন একেবারে সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ভাবের এই তীব্রতা আর দশটি কমলমণির সঙ্গে বাস করিলে জন্মিত না। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কাব্যকৌশলে নূতন ছাঁচের জিনিসটি স্বাভাবিক ও সুন্দর করিয়া গড়িতেন। এ সংসারে তাহার কেহ ছিল না, এমনি করিয়া কুন্দনন্দিনীটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়াই সে জমীদারের ঘরে আশ্রিতা ছিল। সুযোগের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বাপীতটে খাঁটী ইউরোপীয় ধরণে কুন্দকে 'কোর্ট' করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু সুকৌশলে বিলাতী ছাঁচ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু দীনবন্ধু সর্ব্বদাই স্বদেশের ছাঁচ বজায় রাখিয়া নূতন উন্নত ভাব ফুটাইতেন। নারী জাতি

কেবলমাত্র উপভোগের পদার্থ নয়, তাঁহাদের একটা মহাত্ম্য ও মর্য্যাদা আছে, তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে গৃহ উজ্জ্বল হয়, সমাজ পবিত্র হয়; এ আদর্শ দীনবন্ধুর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে কেহ স্থাপন করিয়াছেন কি? তাঁহার হাস্যরস ও নাটকের চরিত্রবৈচিত্র্যের মধ্যে কুত্রাপি এমন কিছু নাই, যাহা অসাধু, অকল্যাণকর, কিংবা নারীজাতির মাহাত্ম্যের বিরোধী। এ সকল কথা বিশেষ করিয়া পরে বলিবার সুবিধা পাইব।

(৩) সুরধুনী কাব্য।—বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, সুরধুনী কাব্য যাহাতে প্রচারিত না হয় "আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই।" যে বিষয়ের বর্ণনায় ঐ কাব্য লিখিত, তাহাতে উহা খুব উচ্চদরের খণ্ডকাব্য হইতেই পারে না। দীনবন্ধু নিজে যে ঐ কাব্যখানি কাব্যকৌশলের একটা বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তবে কেন যে তিনি বঙ্কিমবাবুর মত বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, কাব্যখানি পড়িলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারি। সে কথা পরে বলিতেছি। কাব্যখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন রেবরেণ্ড লালবিহারী দে উহার নিন্দা করিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। সে সমালোচনায় কবির ছন্দ ও ভাষার দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয় নাই। এ নিন্দার কোনও মূল্য নাই; কারণ, দীনবন্ধুর ভাষা সর্ব্বত্রই সুমার্জ্জিত, এবং ছন্দ-অতি নির্দ্দোষ। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোথাও ছন্দঃ-পতন হওয়া দূরে থাকুক, বরং সুরধুনীর মত উহার ধারা বহিয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয়ান রেবরেণ্ড হয় ত "সুরধুনী" নামের কাব্য দেখিয়াই বিরক্ত হইয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে সিঁদুরে মেঘের ভয় অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে অনেক কৃতী ব্যক্তির প্রশংসায় তাঁহার ঈর্ষ্যাও হইয়াছিল, ইহাও অনুমান করা যায়।

গঙ্গাকে ভগীরথ আনিয়াছিলেন কুলপাবনের জন্য; কিন্তু দীনবন্ধু সেই বঙ্গসৌভাগ্যবিধায়িনী তটিনীর কূলে কূলে বহু শতাব্দীর নির্জ্জীবতার পর নবজীবন-সঞ্চার দেখিয়া, সেই নবজীবন মাহাত্ম্যের বর্ণনা করিবার জন্য গঙ্গাস্রোতকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু স্বদেশবৎসল ছিলেন; স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক ছিলেন। তাই তিনি যখন দেখিতেছিলেন যে, নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে দেশ ঝলসিয়া না গিয়া, আবার মাথা তুলিতেছে, তখন গঙ্গাবাহিনী ধরিয়া নব দেশের নূতন বর্ণনা লিখি-

য়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সমাজ সংস্কারক পর্য্যন্ত সকলের কথাই সাগ্রহে ও সোৎসাহে লিখিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা নব-বঙ্গে নবজীবন দিয়াছেন, কবি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের মহিমা গাহিয়াছেন;—রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, রামতনু, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, নবীনকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রাণ খুলিয়া সমকালের লোক-দিগকে মহাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। যাঁহারা হত-ভাগ্য বঙ্গের উন্নতিকল্পে একখানি ভাল নূতন ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, স্বদেশবৎসল তাঁহাদের নাম করিতেও ভুলেন নাই। যিনি তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার প্রশংসা করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রথম ভাগে কৃষ্ণমোহনেরও প্রশংসা ছিল। দীনবন্ধুর মত গুণগ্রাহী উদারচরিত ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। সুরধুনী কাব্যখানি কবির উৎকৃষ্ট কাব্য-শিল্পের সাক্ষী না হউক, উহা তাঁহার পবিত্রতা, স্বদেশবৎসলতা ও উদারতার অক্ষয় সাক্ষী।

ভোঁতারাম ভাটের প্রতি প্রযুক্ত পরিহাসে যখন কিছুমাত্র তীব্রতা নাই, এবং কবি যখন লালবিহারীর গুণকীর্ত্তনেও অকুণ্ঠিত, তখন, অন্যায় সমা-লোচনার প্রতি একটা কটাক্ষকে দীনবন্ধুর চরিত্রের "ক্ষুদ্র কলঙ্ক" রূপেও বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

## ২। বঙ্কিম-দীনবন্ধু।

"ক নু মাং ত্বদধীন জীবিতং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষত সেতু বন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

* * * *

স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।"

আনন্দমঠ।

---

"দুটি তারা, দুই দিকে, দীপ্তির আকর,
ভাসি বঙ্গ-কবিতার নবীন গগনে,
অমর জ্যোতির সুখে হেরি পরস্পর,
অমর জ্যোতির প্রেমে বাঁধিল দুজনে।

এক জননীর পাশে বসি দুই জনে,
দুই জনে ধরি মার দুইটি চরণ,
সাজাল আনিয়া, যেথা কবিতা-কাননে,
যে ফুল ছড়াত সুখে অমর কিরণ।

এক জন, সদা হাসি চিত্ত-জোছনায়,
ফুটায়ে অমর-প্রভা 'মালতী' 'মল্লিকা',
হেসে হেসে দিয়েছিল অমরসখায়
অমরের গলভূষা, অমর-মালিকা।

আর একজন, পশি 'যমুনাপুলিনে',
দুই দিন পরে, 'ফিরি একা বনে বনে',
বহিবে যে শোক-ভার, 'বিকচ নলিনে'
ফুটায়ে তরুণ তান তাহারি স্মরণে,

বঙ্কিমচন্দ্র।

দীনবন্ধু।

" এক বৃন্তে ফুল দুটি,          ববষ ববষ ফুটি "

নবীনচন্দ্র।

ACME PRINTING
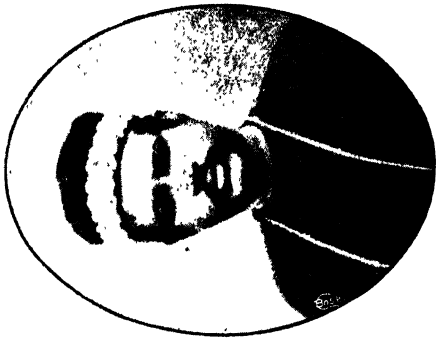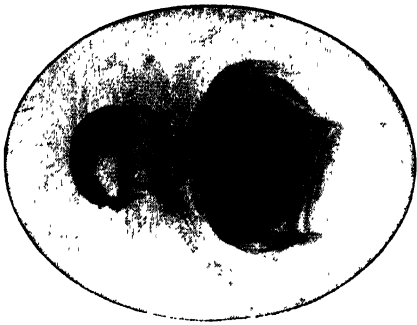
প্রেম-গীতিময় প্রাণ ঢালিল সখায়
বিরহের মধুময় অমরগাথায়।

আজি কতদিন, হায়, মিশেছে অমায়
সে 'মালতী মল্লিকা'র জীবন জোছনা;
আজি কতদিন হ'ল, অমৃত সুধায়,
ভুলেছেন জীবনের যাতনা, তাড়না।

হাহাকার করি বঙ্গ করিল রোদন,
দেবতার তরে কার না ঝরে নয়ন?
জীবন-সখার তার প্রাণের ক্রন্দন,
শুনিল কেবল সেই অন্তর্যামী জন;
সেই ব্যথা, সে হৃদয়ে গাঢ় রেখাময়;
সেই প্রেম সে সখার, ভুলিবার নয়।

তাই, কত বর্ষ পরে, দাঁড়ায়ে যখন
আনন্দমঠের দ্বারে, গীতিময়-প্রাণ,
লয়ে ভক্তি-গীতিময় কুসুম চন্দন,
করি সপ্তকোটী প্রাণে বেগে বহমান
একপ্রাণ জীবনের তড়িৎ প্রবলা,
গেয়েছিল মহাগীত, আনন্দে অধীর,
"সুজলা, "সুফলা" সেই অনন্ত-শ্যামলা,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাজননীর;
তখন অপর দিকে ডাকিল হৃদয়
'ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ' সে জীবনসখায়,
অমরপ্রেমের এই মহা দিগ্বিজয়,
'স্বর্গ মর্ত্ত্যে এ সম্বন্ধ' কভু না ফুরায়।

বৈশাখ, ১৩০১ সাল।
কটিকচারি, চট্টগ্রাম।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

## ৩। দেবস্বপ্ন।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

শুক্ল একাদশী নিশি চারু শোভাময়ী
জল স্থল পুলকিয়া দাঁড়াইয়া ওই;
অতুল অর্দ্ধেন্দু ফোঁটা বিরাজিত ভালে,
সুনীল কুন্তল শোভে তারকার জালে।

অনন্ত অম্বরময়ী যামিনী হাসিছে,
নিয়ে শুভ্র সুবসনা তটিনী ছুটিছে;
তরল-তরঙ্গা গঙ্গা প্রসন্নসলিলা
দুকুল প্রসন্ন করি করিতেছে লীলা।

তীরেতে নির্ব্বান চিতা ভস্ম-আচ্ছাদিত,
ভস্ম-তলে দেব-অস্থি-গুলি লুক্কায়িত;
সেই দেব শরীরের পুণ্য অবশেষ
পুণ্যময় করিতেছে শ্মশান-প্রদেশ।

সেই ভস্ম রাখিবারে যত্নে চিরদিন,
বসেছি শ্মশানে যেন আমি পিতৃহীন;
নয়নে বহিছে মোর সপ্ত-সিন্ধু নীর,
হৃদয় প্রলয়ে যেন হয়েছে অস্থির।

দেখিলাম জাহ্নবীর পবিত্র সলিল
উথলিয়া উঠিতেছে সেথা তিল তিল;
ভাসাইয়া নেয় বুঝি রক্ষিত সে ধন,
দগ্ধ হৃদয়ের সেই শীতল চন্দন।

তখন ধরায় লুটি কাঁদিলাম কত
অনাথ বালক হায় পাগলের মত;
বলিলাম করজোড়ে "পতিত পাবনি—
শীতল সলিলে তব আছে কি অশনি।

"ভাসা'ওনা এই ভস্ম সলিলে তোমার,
নিঃস্বের সর্ব্বস্ব এ যে প্রাণ অভাগার ;
একা এ আমার নয়' সমগ্র বঙ্গের
কাঙ্গাল প্রজার এ যে আলো নয়নের।"

"এই ভস্মে ঢাকা আছে মধুময় প্রাণ,
মোহন ধ্বনিতে যার বহিত উজান
সর্ব্ব দুঃখ-তরঙ্গিণী ; সুধার আধার-
যথা মধুময় ছবি পূর্ণ চন্দ্রমার।"

"সুধাকর পাশে হেথা তেজ আদিত্যের,
অমিত অদ্ভুত বল অমিয়-প্রাণের ;
এই ভস্ম ত্রাণ-মন্ত্র চির পীড়িতের,
অসীম অনন্ত হেথা বন্ধুত্ব দীনের।"

"ওই দেখ নীলকর বিষধর শিরে
আর্ত্তবন্ধু নরবর দাঁড়াইয়া ধীরে,
দলিত করিছে সেই ভীষণ ভুজঙ্গে,
নিস্তারিতে দংশ হতে এ সুবর্ণ বঙ্গে।"

"এই দেবতার ভস্ম দিব না তোমায়,
যতনে রাখিয়া দিব তাপিত হিয়ায় ;
শূন্য করি ভাগ্যহীন গৃহ বাংলার,
ভাসা'ওনা এই ভস্ম সলিলে তোমার।"

অকস্মাৎ সে সলিল হতে বাহিরিয়া
রজত-রূপিণী মূর্ত্তি দাঁড়াল মোহিয়া ;
সর্ব্বাঙ্গে করুণা-ধারা বহিতেছে যার,
মমতা বদন খানি, ভাষা স্নেহ-সার।

বলিলেন "কেন বৎস বৃথা এ রোদন ;
এই ভস্ম ভাসিবে না সলিলে কখন ;
দেব-বহ্নি এর মাঝে আছে যা সঞ্চিত
নির্জীবে করিবে তাহা চির উদ্দীপিত।"

"আমার এ পুণ্য নীরে পুণ্য ভস্ম এই
রহিবে অনন্ত কাল হয়ে মৃত্যু-জয়ী ;
কল্লোলিনী সুরধুনী যাবৎ বহিবে,
দীনবন্ধু নাম বঙ্গে নিত্য নিনাদিবে।"

"দিব্য কর বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল দর্পণে
দেখিবে বঙ্গের লোক জ্বলন্ত বরণে,
আর্ত্তের উদ্ধার হেতু শরীর পাতন,
নিঃস্বার্থ পরের হিতে মুক্ত প্রাণপণ।

"সাধ্বীর নয়ন-নীরে ক্ষুদ্র তৃণ প্রায়
দুর্ব্বৃত্তির ঐরাবত দূরে ভেসে যায় ;
নির্দ্দোষীর রক্ত-স্রোতে মুক্তি-বীজ ফুটে,
প্রাণময় গোমুখীর শত ধারা ছুটে।"

"বীরধর্ম্ম চিরদিন দুষ্টের দমন,
ভুজবলে নৃশংসের সমূলে নিধন ;
এই কর্ত্তব্যের পথ অঙ্কিত হেথায়
দিবাকর দীপ্তি যথা সুপ্ত পূর্ব্বাশায়।"

"আমার এ নীরধারা যত দূর বয়
এ দর্পণ আলোকিবে সমগ্র আলয়,
প্রতিগৃহ উজলিবে নবীন মাধবে,
মহাপ্রাণ তোরাপের বীর অবয়বে।"

সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা প্রভাত আলোকে,
বিহঙ্গ উঠিল গাহি প্রভাতী পুলকে ;
বুঝিলাম দৈববাণী কভু মিথ্যা নয়,
বঙ্গ মাঝে জাগিতেছে বীরের হৃদয়।

রাসপূর্ণিমা ১৩১৩,
দীনধাম, কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

---

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩০।৩ মদন মিত্রের গলি "দীনধামে" ও গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| নীলদর্পণ | ... | ... | ... | ১৲ |
| নবীন তপস্বিনী | ... | ... | ... | ১৲ |
| বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো | ... | ... | ... | ৸৹ |
| সধবার একাদশী | ... | ... | ... | ১৲ |
| লীলাবতী | ... | ... | ... | ১॥৹ |
| জামাই-বারিক | ... | ... | ... | ১৲ |
| কমলেকামিনী | ... | ... | ... | ১৲ |
| সুরধুনী কাব্য | ... | ... | ... | ১৲ |
| দ্বাদশ কবিতা | ... | ... | ... | ॥৹ |
| পদ্যসংগ্রহ ( জামাই-ষষ্ঠি সহিত ) | | ... | ... | ॥৹ |
| যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর | | ... | ... | ।/৹ |
| দীনবন্ধু জীবনী ( বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত ) | | ... | ... | ।৹ |
| দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী ( প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তলিপি সহিত ) | | | ... | ৪৲ |

**HISTORY OF INDIGO DISTURBANCE,**
(with full Reports of the Nil Durpan case, and the Lieutenant Governor Defamation case)
By Lalit Chandra Mitra M. A. ... one Rupee.

দীনধাম,
কলিকাতা

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।